জয়কলস

মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪, ০১৭১৫৪৯৮৭৯৩৫
e-mail. utsopro2001@gmail.com

প্রচ্ছদ
মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ২০০ টাকা

Joykalos [Victory picher] : A play by Mahmood Nasir Jahangiri
Published by Mustafa Salim of Utso Prokashan, 127 Aziz super market (2nd floor), Shahbagh, Dhaka 1000

ISBN : 978-984-98159-8-3

ভাটিবাংলার কৃষক আন্দোলনের
একটি অলিখিত উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত

ধারাক্রম

প্রথম দৃশ্য
চাশনিপির ও মাটির কলস
দ্বিতীয় দৃশ্য
সুরমার পতিত জমিতে শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহের আবাদ
তৃতীয় দৃশ্য
যমুনার তীরে কুম্ভমেলা, সুরমার তীরে কলসভাসান
চতুর্থ দৃশ্য
ম্যাগনেটিক পিলার গাড়ার রহস্য
পঞ্চম দৃশ্য
মাছরাঙাশিকারি নিশাচরের দল
ষষ্ঠ দৃশ্য
ভরাকলস : সিদ্ধি, সাফল্য ও বাঞ্ছাপূর্তি
সপ্তম দৃশ্য
রঙের নাও রঙের বৈঠা
অষ্টম দৃশ্য
করতোয়ায় পলোওয়ালা, সুরমায় বৈঠাওয়ালা
নবম দৃশ্য
জয়কলসের মীরবহর ও লাঠিয়ালদের বধুঁবরণ

চরিত্রলিপি

শচীন : কুমার
প্রাণেশ : কুমার
গফুর আলী : কৃষক
রুস্তম খাঁ : কৃষক নেতা
জব্বার : কৃষক
সজীব : কৃষক
এন্ডারসন : নীলকর
ডানলপ : নীলকর
কালা : কৃষক
১ম বৈঠাওয়ালা
২য় বৈঠাওয়ালা
৩য় বৈঠাওয়ালা
১ম লাঠিওয়ালা
২য় লাঠিওয়ালা
৩য় লাঠিওয়ালা
এবং
সুরমা : শচীনের কুমারী কন্যা [দৃশ্যের অন্তরালে]
স্থান : সুরমা নদীর তীরবর্তী জয়কলস গ্রাম, সুনামগঞ্জ
কাল : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

প্রথম দৃশ্য
চাশনিপির ও মাটির কলস

সূত্রধার : হজরত শাহজালাল স্বপ্নে দেখেন এক রাজপুত্র ভারতের পূর্বপ্রান্তে মাটিতে গাড়ছেন ইসলামের ঝাণ্ডা। বুজুর্গ আহমদ কবির এক মুষ্ঠি আরবের মাটি দিলেন শাহজালালের হাতে। এই মাটির সাথে ভারতের যে মাটির সাদৃশ্য হবে সেখানেই উড়বে জয়ের নিশান। চাশনিপির সঙ্গে যাবেন, যিনি মাটি চুষে মাটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ছিলেন দক্ষ। দুনিয়ায় কত প্রকারের মাটি আছে! লবণ চাষের জন্য শর্ত উপকূলীয় মাটি, চিনাল চাষের জন্য চরের মাটি আর জুম চাষের জন্য পাহাড়ি মাটি। নারকেল গাছের জন্য লবণাক্ত মাটি, হিজল গাছের জন্য হাওরের মাটি, কাঁঠাল গাছের জন্য লাল মাটি আর চালতা গাছের জন্য ছাই মাটি। ইসলামি ঝাণ্ডা উড়ানোর জন্য কোন মাটি? হজরত শাহজালাল বাগদাদে এসে সাক্ষাৎ করেন হজরত শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে, দেখতে পান হালাকু খানের পতাকার নিচে দোয়াবের মাটি। ইরানের তাব্রিজ, সিরাজ হয়ে আসেন আফগানিস্তানের গজনি ও জালালাবাদ। চাশনিপির পাকিস্তানের মুলতান এসে দেখতে পান এ মাটি গায়ের ত্বকের জন্য মহৌষধ। এককালে এখানে এসে থেমে গিয়েছিল মুসলমানদের বিজয়ের ঘোড়া, হজরত শাহজালাল তার সঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন শাহ আরফিনকে। শাহ আরফিন পথ দেখিয়ে নিয়ে আসলেন কাফেলাকে দিল্লি। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছ থেকে উপহার পেলেন কবুতর–যে পাখি মাটি থেকে খুঁটে খেতে ভালবাসে ধান। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ শেষে আসেন বাংলার পাণ্ডুয়ায়। চাশনিপির দেখতে পান মেলে না পাণ্ডুয়ার মাটি আরবের মাটির সাথে। শেষে সিকান্দার গাজী খান ও সিপাহসালার নাসিরউদ্দিনকে নিয়ে বাহির হন সিলেট অভিযানে।

গাজী সাহেবের নাম সেক সেকান্দর।
চৌদ্দ বছর যুদ্ধ করল কুড়লীর ভিতর ॥
অগ্নিবাণ খাইয়া বেটা গেল পলাইয়া।
কুবাইতনে শাহজালালরে লইয়া আইল গিয়া ॥

১২৯১ সাল থেকে চৌদ্দ বছর যুদ্ধ করার পর মুসলিম শাসনের অধীন হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের গৌহাটি, কাছাড়, ত্রিপুরা ও আরাকানদেশ। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দক্ষিণ শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম–সব রাজ্যই জয় হয়। শুধু সুরমা নদীর উত্তর পাশ, পশ্চিম-উত্তর অংশ থাকে অজেয়। ১৩০৪ সালে বর্ষাকালে বাঁশের ভেলায় চড়ে সে নদীও জয় করেন হজরত শাহজালাল :

যখনে পৌঁছিলা তিনি নদীর কিনার।
নৌকা বিনা সেই নদী হইলেন পার।

ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ১০০ বছর পর ভারতের পূর্ব প্রান্তের শক্ত মাটিতে বিজয়ীর বেশে দাঁড়ালেন শাহজালাল। সিলেট বিজয়ের পর সিকান্দর খান গাজী গৌড়রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন সিলেটে।

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ বিজিত হয় সবার শেষে। চাশনিপির মাটি পরীক্ষা করে দেখতে পান আরবের মাটির সঙ্গে সিলেটের মাটির মিল। চুনাপাথর সমৃদ্ধ সিলেটের মাটি আরবের মাটির মত প্রাচীন। এতো প্রাচীন যে, তার মাটির নিচে যেন চাপা পড়ে আছে শত বছরের গুপ্তধন। মাটি চকচকে, ঝাঁঝালো তার ঘ্রাণ। শুধুমাত্র তার পাতাল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেই মাটি হয় এতোটা চমৎকার। আত্মার সৌন্দর্য যেমন দেখা যায় মানুষের মুখমণ্ডলে; সিলেটের গুপ্তধনের সংবাদ তেমনি ফুটে আছে তার মাটিতে। দেখা যায় সমতলে হাওরের মাটি খুবই উর্বরা। তার মাটি খনিজ পলিমাটি–ভাটি এলাকায় যাকে বলা হয় মুরহা বা আঠালি মাটি। মাটিতে মিশানো যেন গাছ থেকে নির্গত সুগন্ধি তেল। তিসি বা সরিষার তপ্ত মণ্ড যেন মাখানো মাটির বুকে। এই মাটি দিয়ে বানানো কলসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। মুরহা এমন এক গাঢ় মাটি, যে মাটির গুণে হাওর হয়ে যায় কুমারদের সবচেয়ে বড় তীর্থ আর কৃষিবিপ্লবের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। পোয়াতি নারীদের প্রসবব্যথায় মরিয়ম ফুল, তার খাদ্যের অরুচিতে তেমনি রুচিবর্ধক এখানকার মাটি। হাপরের আগুনের তাপে যেমন সেকা হয় নানরুটি, এমনি সুখাদ্য এখানকার পোড়া মাটি। নারী গর্ভেশ্বরী, কলসও তাই।

শচীন : দাদনের দেনা, চতুর্দিকে যেন আন্ধাইর দেখি। আগুনেরতে নামাইয়া হগল মাল বেইচ্যা দিছি পানির দামে।

প্রাণেশ : হঠাৎ এর মধ্যে বেচলা কার কাছে? কি দর?

শচীন : কইলাম তো পানির দরে। করতাম কি? পুরির বিয়া। এই হাতির খাওন জোগাইত কেলায়? একটা বিয়ার বাজারহাট। বোঝোতো ঠেলাডা।

প্রাণেশ : ভালা ভালা তবু দিয়া দেও, যাউক কষ্ট শইল্যের ওপর দিয়া। তামাকাসা, বেসাতির ধুতি, টেহা পইসা, শালগেরাম শিলা–হগল আঞ্জাম আগেই ঠিক কইরা রাহো। বিয়ার ব্যাপার কেবল ঝামেলা। বিয়া দেওয়া আর বাপের ছেরাদ্দ করা যেন সমান কথা।

শচীন : জানের ওপর দিয়া, মালের ওপর দিয়া যাইব ক্ষতি কিছু নাই। কিন্তুক কাণ্ড একটা অইয়া গেছে। ঘুমের তে উইঠা দেহি বিয়ার কলসখান নাই।

প্রাণেশ : কলস চুরি অইয়া গেছে? খুঁইজ্যা দেখছো?

শচীন : নাই নাই। এই ঘর ঐ ঘর। তামাম বাড়ি থাইকা উধাও।

প্রাণেশ : এই ঘর, ঐ ঘর খুঁইজ্যা পাইবে? পাইবে তো যাও শাল্লায়। শাল্লাতো আর দূর না। দুই কদম পা ফেল্লেই শাল্লা, বৈঠায় দুইখান বাড়ি দিলেই শাল্লা।

শচীন : শাল্লা গিয়া তত্ত্বতালাবি কইরা আমি জান লইয়া ফিরা আইতে পারবে? চোরের গ্রামের লোক রাতে করে পরের বাড়ি চুরি, দিনে করে নিজের আঁটিতে ডাকাতি। হেই গ্রাম থাইকা ফিরা আসতে পারে সেই বেডাইন–যার কান্ধের ওপর আছে দুইডা মাথা, সিনার মইধ্যে আছে কইলজা দুইখান।

প্রাণেশ : এক কাম করো। কিন্যা আনো আর একটা। শাল্লার বাজারেই পাইবা আরো নতুন ঝকঝকা চুনাপাথরের লেপ দেওয়া পিতলা কলস। মিল্টন সাহেবের চুনাপাথরের ভাটায় যে আছে পিতলা ঘুঘুদের রাতের আনাগোনা। এদের বুকপেট নাই বোঝলা।

শচীন : আমার আতো আর কানাকাড়িও নাই যে আমি চোরাই মাল কিনি। ইচ্চা অয় মাইরা লাও। আমি আর পারতাম না। পুরির বিয়া যেন এই দেহডারে হাফরের মধ্যে আগুনে পোড়ানো।

প্রাণেশ : ভালাই অইলো। আগুনে পুইড়া খাঁটি সোনা অইবা এইবার!

শচীন : চিন্তা কইরা দেহোনা। পর্থমেই একটা অলক্ষ্মীর চিন্। পর্থমেই মানা, পর্থমেই নিষেধ। পুরির কপালে যে কি আছে! বিধাতায় ওই কইতে পারে।

প্রাণেশ : পোয়ার আত্মীয়স্বজন কি? ঘরদুয়ার, ব্যবসাবাণিজ্য, রোজগারের হদিস। এই সবতো খুঁইটা খুঁইটা জানন চাই।

শচীন : খুঁইট্যা খুঁইট্যা আবার কি? আমার পুরির কি বিয়া অইবো চৌধুরী নায়েবের লগে? আমার পুরির কি শাদি অইবো জলমহালদারের ঠাঁই? জমিদার কি বিয়া করে মাইমালের পুরিরে। পোয়ার ব্যবসাবাণিজ্য আর কি অইবো? ব্যবসার মধ্যে ঐ মাডির কাম। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়াই বানবো। কষ্ট কইরা, কই মাছের মত কানকো উজাইয়া হামাগুড়ি দিয়া জীবনডা বাঁচাইবো। কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। জান তেজপাতা কইরা পোয়া যে একখান মিলা গেল, এহানেই শুক্কুর মানো না!

প্রাণেশ : ঐডা কুসতা না। কপালে যা আছে তাই অইবো। এইডা লইয়া ভাইব্যাও লাভ নাই। জৈন্তা পাহাড়ের নহর সুরমা আইসা মিশবো। সুরমা নদীর পানি ভৈরবে গিয়া মিলবো মেঘনা নদীর সাথে।

শচীন : পুরিডারে তো তুমি চিনো। আউস কইরা তার মায় নাম থইছে সুরমা। ঠান্ডা, চুপচাপ, কথাবার্তা কম, বেশি আবদার নাই। ছোটবেলা থাইকা ঐ দেখছি বেশি মাতে না। কেমন যেনো আনমনা।

প্রাণেশ : পুরি অইলো তোমার সুরমা নদী। হাজারে একখান সেরা মাইয়া। সুরমা রানি যেন স্রোতভাইটাল নদী—মাইনসে কডু কথা কইব তার জোগার রাহে নাই।

শচীন : সুরমা বেডির কপালে যে কি আছে কেডায় কইতো। আচ্ছা কওতো–কলসিখান নিল কেলায়? কলসি নিতে কি বিদেশের চোর আইছে? কালা চুরা বা শুক্কুর ডাহাইত?

প্রাণেশ : দুরু কালা চুরা আর মালা চুরা। চিনা মানুষই অইবো। দেহোগা আপনা মানুষ অই কেউ অইবো। হয়তো পাড়ার কেউ।

শচীন : পাড়ার চোর নাতো কি? চোর আইছে কামারগাঁও থাইকা? আমারতো সন্দেহ লাগে হারামজাদা দুর্গাচরণ অইব। কেবল খারাপের চিন্তা বদমাইশের মাথার মাইজে ঘুরে।

প্রাণেশ : কেউ দেখছে উকছে নি? অথবা তার কোন আলামত।

শচীন : আরে-এ দেখতো কি? এতো দেহাই। ঐ গিধরের বাচ্চায় না করলে করত কেলায়। আমারে পাইছে নরম মাটি। তার একপাল পোলাপাইনরে লাগাইয়াই রাখে কেদার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বাইম

মাছ শিকারের লাইগা। ঘুম তাইকা উইঠা দেহি এক রাইতেই আমার গাছের চৈলতা সব সাবাড়। চৈলতা ভর্তা কইরা আচার বানানোর সে বড় কারিগর। আমি সন্ধয় করি ঐ দুর্গাচরণেরই।

প্রাণেশ : ভালাই অইছে। এই সুযোগে পাশাইয়া দেও হারামজাদারে। আগামী বুধবার নায়েব আইব তহশিলদারিত। বিচার দিবা কাজি বরাবর।

শচীন : খাজনা আদায়ে যে আসে কোন দিন। কইতে পারো?

প্রাণেশ : বাজনা হুনলেই তো বুঝতে পারবায় খাজনা আদায়ের দিন। কথা হোনো রে বা। চিন্তা কইরো না। বিচার দিও তুমি কলস চুরির। পুরির বিয়ার কত খরচপাতি–বুঝাইয়া কও তুমি জমিদার বাবুরে। ঠিকমত কইতে উইতে পারলে দেইখো খাজনা ছাইরা দিব এক নিমিষে। তাইনাগো মতিগতির ঠিক নাই। দয়া হইয়া গেলে সাহায্য অতো অইতো পারে।

শচীন : তাইলেতো ভালই অয়। তাইনেরা বড়লোক মানুষ। হাত ঝাড়া দিলে আমার ভাইসা যাইব। লক্ষ্মী নি মুখ তুইলা চাইব আমার দিগে।

প্রাণেশ : তার কলকাঠি কোন্‌ভাবে যে লড়ে বুঝা বড় দায়, বোঝলা? খাজনা মাপ অইয়া কোছতা সাহায্যও হইতে পারে। তাছাড়া দেবতা যেন নিজ আতেই এইবার দুর্গার গলায় দড়ি লটকাইবো। ভাইবো নারে বো–আগামী বুধবার পর্যন্ত বার চাইয়া দেহ।

শচীন : অয় অয়। জয় রাধামাধব, জয় রাধামাধব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুরমার পতিত জমিতে শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহের আবাদ

সূত্রধার : ১৫৭৬ সালে দাউদ কররানির পরাজয়ের পর মেঘনা শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। দাউদ কররানির নামানুসারে গোমতীর তীরবর্তী নৌবন্দরের নামকরণ করা হয় দাউদকান্দি। তার উত্তরে সিলেট, দক্ষিণে সুন্দরবন, খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে বাদাবন পর্যন্ত এলাকায় ঘটে বিদ্রোহের অভিবাসন, নদীর অববাহিকা বরাবর। প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয় জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমি ও জলাশয় এলাকায়। বিস্ময়কর ইতিহাসের সূচনা করেন বারোভূঁইয়াদের মধ্যে কাতরাব, চাটমোহর, বিক্রমপুর, ভুলুয়া, চন্দ্রদ্বীপ, ভূষণা, যশোর, বানিয়াচং, বোকাইনগর, ভাওয়াল, পাবনা, শাহজাদপুর, তরফ, খালিয়াজুড়ি, সরাইলের জমিদারগণ। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর সংগ্রামের সূচনা করেন বিতাড়িত আফগান ও বাংলার জমিদারগণ।

প্রায় তিরিশ বছর শীতলক্ষ্যার তীরে মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খান লড়াই করেন ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে। ঈসা খাঁ প্রধান দুর্গ স্থাপন করেন কাতরাবে শাল বনের জঙ্গলে। তার রাজত্ব ছিল বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ নিয়ে। এগুলো ছিল সোনারগাঁ ও বাজুহা পরগনার অধীন।

উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত আফগান সর্দার ১৫৯৩ সালে বাংলায় পদার্পণের পর বোকাইনগরে হয় তাঁর অধিষ্ঠান। ১৫৯৯ সালে ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মুসা খাঁ ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে যোগ দেন মিত্র হিসাবে। ১৬০২ সালে বানার নদীর তীরে মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও খাজা ওসমানের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ১৬০৩ সালে বিক্রমপুরের কেদার রায় যখন মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন ওসমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে মোগল এলাকায় আক্রমণ চালান। তরফ, খালিয়াজুড়ি, বানিয়াচং ও সরাইলের জমিদার সবাই মোগলের বিরুদ্ধে একাট্টা, তবে তাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাজা ওসমান। আত্মসমর্পণ জানে না ওসমান।